ও মাই কোলকাতা
ঘনার বচন

সাবর্ণ রায়চৌধুরী- এই নামটা কি চেনা চেনা ঠেকছে? চেনা ঠেকবেই তো! কোলকাতার ইতিহাস তো এই পরিবারকে ঘিরেই রয়েছে। হাংরি জেনারেশনের কবি মলয় রায়চৌধুরী তো এই পরিবারেরই সন্তান! মজার ব্যাপার হচ্ছে- এই নামে কোনো ব্যক্তি ছিলেন না! এঁদের পূর্বপুরুষ হচ্ছেন, জিয়া গঙ্গোপাধ্যায়! পরে ইনি কামদেব ব্রহ্মচারী নামে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন। রাজা মানসিংহ এনার কাছে দীক্ষা নেন। তা থাক, সে সব ইতিহাসের কচকচানি!!!

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে- জিয়া গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন ব্রাহ্মণ আর তাঁর গোত্র ছিল- সাবর্ণ। এবার, রায়চৌধুরী বা চৌধুরী হলো মোঘল আমলের জমিদারদের খেতাব। পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন, জিয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের উত্তরপুরুষ। এনার আবার আর একটা নাম ছিল- পাঁচু শক্তি খান! যাই হোক, এই মোঘল নথীতে এনাদের জমিদারীটা গোত্র এবং জমিদারদের উপাধি- রায়চৌধুরী দিয়ে নথীভুক্ত হয়েছিল। তাই এঁরা সাবর্ণ রায়চৌধুরী নামেই পরিচিত ছিলেন। ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটির সত্ত্ব সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের কাছ থেকে ইজারা নেয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কত টাকায় জানেন? এক লাখ টাকায়! ইস্! তখন যদি আমাদের পূর্বপুরুষরা বুদ্ধি করে খানিকটা জমি কিনে রাখতেন, তা হলে বেচে বেচেই টাকা কামাতাম। কষ্ট করে আর চাকরী- বাকরী করতে হতো না!! কি বলেন? যাক! দুঃখ করে লাভ নেই! বরং কোলকাতা নিয়ে দু একটা জানা- অজানা কথা বলি!

আপনারা কি জানেন- খোদ কোলকাতায় যে কোন বর্ণের লোক এবং ব্রাহ্মণদের ভাত খাওয়া বারণ? কারণ?মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি। এবার মহারাজা নন্দকুমার ছিলেন – ব্রাহ্মণ। মুর্শিদাবাদী এই ব্রাহ্মণের ফাঁসি সকলে মেনে নিতে পারেন নি। কুলিবাজারের নৈঋত (দক্ষিণ- পশ্চিম) কোণে রাজা নন্দকুমারের ফাঁসী হয়। আজ পর্যন্ত ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে কারও প্রাণ এভাবে নেওয়া হয় নি, মহারাজা নন্দকুমার ছাড়া!!!!! ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত দ্য ট্রায়াল অব মহারাজা নন্দকুমার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, মিডলটনের পত্রালাপ দাখিল করা হলে ওয়ারেন হেস্টিংস ঘুষ নেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হতেন। ওয়ারেন হেস্টিংস, তাঁর বন্ধু ইলাইজা ইম্পের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ বের করেন। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি ওয়ারেন্ট হেস্টিংসের জীবন ও কর্মকাল এবং কোলকাতার একটি বিতর্কিত অধ্যায়।

মাত্র ২৩ বছর বয়সে সিরাজউদ্দৌলা ১৫ এপ্রিল ১৭৫৬ সালে নবাবী লাভ করেন। তার নবাবীর সময়কাল ছিল মাত্র ১ বছর ২ মাস ৮ দিন অর্থাৎ ৪৩৪ দিন। এ সময়ের মধ্যে নবাব সিরাজউদ্দৌলা দু'দুবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলকাতা অভিযানে স্বয়ং নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ইংরেজদের পরাজিত করেছেন। পূর্ণিয়ার যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করেছেন। প্রধান সেনাপতি মীর জাফর, সেনাপতি রাজা দুর্লভরাম, উমিচাঁদ, রাজা রায়বল্লভ, ইয়ার লতিফ, জগৎ শেঠ, ঘসেটি বেগম, ইংরেজ সেনাপতি ওয়াটসন, ওয়াটস, ক্লাইভ প্রমুখ সিরাজউদ্দৌলার নবাবীর প্রথম দিন থেকে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা, রাজদ্রোহ ও দেশদ্রোহিতায় লিপ্ত থেকে নবাবকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। তাতে একদিনের জন্য তরুণ নবাবের ব্যক্তিগত জীবনে কোনো আরাম-আয়েশ ভোগ-বিলাসের সময়-সুযোগ ছিল না। কিন্তু পলাশীর প্রহসনের যুদ্ধে ইংরেজরা ক্ষমতায় আসার পর তাদের এদেশীয় চাকর-বাকর, বুদ্ধিজীবী ও লেখকরা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে চরিত্রহীন লম্পট অপদার্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, কিন্তু তাদের বক্তব্য ইতিহাস ও জনগণ কোনো দিন গ্রহণ করেনি।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগের মূল কারণ বাংলার স্বাধীনতা হরণের চক্রান্তকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে পরিকল্পিত চরিত্র হনন ও অপপ্রচার। অন্ধকূপ হত্যা, যেটা আদতে ঘটেই নি, নবাব সিরাজউদ্দৌলার ওপর সেটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন এক তরুণ দেশপ্রেমিক রাজপুরুষ; যিনি নিজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছিলেন। দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ইংরেজদের কাছে মীর জাফরদের মতো আত্মসমর্পণ করেননি, আপস করেননি। বাংলার নবাব তখন ইব্রাহিম খান। নবাব বলতে মোঘল সম্রাটের কর আদায়কারী। তার আমন্ত্রণে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মাধ্যক্ষ জোব চার্নক ফিরে এলেন বাংলায়। সুতানুটি(মতান্তরে,সুতালুটি) কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম ইজারা নিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম বানাতে শুরু করলেন ব্যবসার প্রয়োজনে। গোড়াপত্তন হল কলিকাতা শহরের। দিনটি ছিল ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট রবিবার। তবে কলিকাতা অবশ্য আরো অনেক প্রাচীন। ১৫৯৬ সালে সম্রাট আকবরের রাজস্ব আদায়ের নকশায়

কলিকাতা বা কলিকাটা দেখানো হয়েছে। ইংরেজরা এর নাম দিয়েছে 'ক্যালকাটা'। ইংরেজ আমলে কলিকাতা ছিল রাজধানী শহর। এখন কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের রাজধানী। আগেই বলেছি, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে জোব চার্ণক নামে একজন ইংরেজ তিনটি স্নিগ্ধ গ্রাম গোবিন্দপুর, সুতানুটি আর কলকাতার তীরে পৌঁছোলেন এবং নবাবের সৈন্যদল কর্তৃক লুণ্ঠিত তাঁর কর্মস্থল হুগলিতে আর ফিরে গেলেন না। তিনি চাইলেন এই গ্রামগুলিতেই শুরু হওয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করবেন। এইখান থেকেই কি ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শুরু হল- তার একটা নমুনা পেশ করি। সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রাম তিনটি ছিল মুঘল সম্রাটের ছিল খাসমহলের অন্তর্গত। এই গ্রাম তিনটির জায়গিরদারি সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের হাতে ছিল। ব্রিটিশ বসতি অন্যান্যদের অধীনে থাকা আরও আটত্রিশটি গ্রাম দিয়ে ঘেরা ছিল। ১৭১৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে এই সব গ্রামের জমিদারি সত্ব কেনার অধিকার অর্জন করলেও, তৎকালীন জমিদারদের কাছ থেকে তারা এই গ্রামগুলি ক্রয় করতে পারেনি। সাবর্ণ রায়চৌধুরীরাও ব্রিটিশদের এই তিনটি গ্রাম ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। জানা যায়, ব্রিটিশরা মুঘল রাজদরবারে ঘুষ দিয়ে এই গ্রাম তিনটির ইজারা কেনার অনুমতি আদায়ে সমর্থ হন।

১৬৯৮ সালে সাবর্ণরা ইংরেজদের হাতে গ্রাম তিনটি তুলে দেন। ইংরেজরা বার্ষিক ১,৩০০ টাকা রাজস্বের বিনিময়ে গ্রাম তিনটির ইজারা ক্রয় করে নেন। চুক্তিপত্রটি ফারসি ভাষায় লেখা হয়েছিল। এর একটি নকল বড়িশার সাবর্ণ সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এইভাবে শুরু হল এক ইতিহাস। প্রথমেই কাঁচা বাড়িগুলি ভেঙে পাকা বাড়ি উঠতে দেখা গেল, ব্রিটিশরা ইজারা নেওয়া গ্রামগুলিকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলল এক দুর্ভেদ্য দুর্গে। দরবারি উত্থান-পতন আর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর থেকে কলকাতা বিকশিত হতে শুরু করল দ্রুত। কিন্তু সেই সময়কার দলিল বলছে, এটা আদপেই কোনো প্রামাণ্য শহর ছিল না। না ছিল রাস্তায় আলো, না ছিল পাকা রাস্তা, না ছিল পরিশ্রুত জল বা পাকা নর্দমা। অকালমৃত্যুর হার ছিল অত্যধিক বেশি। তবু এ শহর অনেককে কাছে টানল। তার কারণ একটাই! এই শহরের অবস্থান! জলপথে, বাণিজ্য করবার সুবিধা! শেঠ আর বসাকরা আগে থেকেই এখানে সুতার ব্যাবসা করতেন। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পর্তুগিজদের বাণিজ্যঘাঁটি ছিল সুতানুটি। পরবর্তীকালে ডাচ (ওলন্দাজ) হুগলি নদী থেকে খাল কেটে এখনকার মধ্য কলকাতাকে সুরক্ষিত করে। ইংরেজদের সুরক্ষিত করতে তৈরি হয় পুরোনো ফোর্ট উইলিয়াম ১৬৯৬-এ। ১৭৫৬ সালে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা এই শহর অবরোধ ও অধিকার করলে খোদ ইংল্যান্ডেও এই শহর খ্যাতিলাভ করে। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে সিরাজ প্রায় ৪৩ জন ব্রিটিশ বাসিন্দাকে একটি ছোট গুদামঘরে গুমখুন করান। এই গল্পটা একেবারেই বানানো!!!!রবার্ট ক্লাইভ পরের বছরই কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন। হুগলি নদীর জলপথে ইংরেজ যাত্রী এবং বাণিজ্যপোতের প্রসার ঘটায়। ১৮৫০-এর দশকে রেলপথ চালু হলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ বৃহত্তর মাত্রা পায়। এই শহর দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যস্থল এবং পাশ্চাত্য ঘরানার ব্যবসায়িক ঔপনিবেশিক এই শহরে নির্দিষ্টভাবে ঘিঞ্জি আর অপরিকল্পিত এলাকায় দেশীয় বাসিন্দাদের জন্য আলাদা পাড়া ছিল মূল শহরের পূর্ব আর উত্তর ঘেঁষে। সুপরিকল্পিত এবং ফাঁকা জায়গায় বসতি ছিল ইউরোপীয়ানদের দক্ষিণ তথা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। স্বাধীনতার পরে এই সাহেবপাড়াগুলি দেশীয় ধনীদের বাসস্থান বা পার্ক স্ট্রিট প্রভৃতির মতো বাণিজ্যিক অঞ্চল হয়ে ওঠে। পার্ক স্ট্রিটের আগের নাম ছিল- ব্যারিয়াল গ্রাউণ্ড রোড।

লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৫৭০ সালের কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন। তাঁর জন্মের তৃতীয় দিনে তাঁর মা, পদ্মাবতী মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুতে লক্ষ্মী কান্ত'র বাবা জিয়া গঙ্গোপাধ্যায় ভেঙে পড়েন, আর সংসার ত্যাগ করে তপস্বী হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফ্যালেন। ছেলে লক্ষ্মীকান্ত'র ভার তিনি নিজের দীক্ষাগুরু আত্মারাম ব্রহ্মচারী'র হাতে সঁপে, বেরিয়ে পড়েন তীর্থ-পরিব্রাজক হয়ে, আর ধর্ম প্রচারক রূপে থিতু হন কাশীতে। সন্ন্যাস নেবার পর তাঁর নামকরণ হয় কামদেব ব্রহ্মচারী। ব্রিটিশ ইতিহাসকারদের নথিতে তিনি এই নামেই পরিচিত। প্রকৃতি, বুদ্ধিতত্ত্ব, অহংকার, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও পুরুষ ইত্যাদি তত্ত্বমূলক দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের কারণে কামদেবের খ্যাতি ছিল। লক্ষ্মীকান্তকে স্তন্যদানের জন্য আত্মারাম ব্রহ্মচারী যাঁকে ধাত্রী নিয়োগ করেন, তিনি অব্রাহ্মণী ছিলেন । ব্যাপারটি বৈপ্লবিক ছিল নিশ্চয়ই, কেননা কামদেবের ঊর্ধতন একাদশতম পুরুষ পীতাম্বর গঙ্গোপাধ্যায়কে কুলীনত্ব দিয়েছিলেন বল্লাল সেন। তাছাড়া দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের মেলবন্ধন-কর্তা দেবীবর ঘটক তখন এতই ক্ষমতাসম্পন্ন যে, তিনি ফতোয়া দিলে, একজন ব্রাহ্মণ কুলীন থেকে অকুলীন হয়ে সমাজের আধিপত্য-কাঠামোয় নিচের স্তরে চলে যেতে পারতেন।

কামদেব ব্রহ্মচারীর ঠাকুর্দা পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন কাটোয়ার আমাটি গ্রামের নিবাসী। পরে তিনি হুগলি জেলার গোহাট্য-গোপালপুরে চলে যান, এবং বাবা পরমেশ্বরের অধ্যাপন, যাজন ও মন্ত্রদানের পারিবারিক পেশা গ্রহণ না করে, ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করে হুমায়ুনের সৈন্যবাহিনীতে আফগান বাহিনীর স্হানীয় অধিপতিহিসেবে যোগ দেন। এখন জায়গাটির নাম গোঘাট। পঞ্চাননের সময়ে গোরুর হাট বসত বলে গোহট্ট। বিভিন্ন যুদ্ধে ঘোড়ায় চেপে সাহসী লড়াইতে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন, এবং সমরনায়ক হিসাবে সম্রাটের কাছ থেকে 'শক্তি খান' উপাধি পান। পরবর্তীকালে আফগানদের আনুগত্য কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত সহায়ক ছিল। ইতিহাসে তিনি 'পাঁচু

শক্তিখান' নামে খ্যাত। তুর্কি ভাষায় শব্দটি হল 'সখৎখাঁ', অর্থাৎ দুর্ধর্ষ রাজকুমার। সৈন্যবাহিনী থেকে অবসরের পর পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় হালিশহরে বসত গড়েন। তিনি বিক্রমপুর থেকে বৈদ্য, কোন্নগর থেকে কায়স্থ, উড়িষ্যা ও তামিলনাড়ু থেকে যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ এনে সবাইকে আলাদা-আলাদা পল্লী বা পট্টিতে থাকার ব্যবস্হা করে দেন। সেসব ওড়িষি আর তামিলদের আজ আর আলাদা করে চেনা যায় না। অন্যান্য পেশার লোকজনও এনেছিলেন তিনি, যাঁদের মধ্যে পরবর্তিকালে খ্যাতি পান মাটির কাজের লোক বা কুমোরেরা; ফলে হালিশহর (প্রকৃতপক্ষে 'হাভেলি শহর') কুমারহট্ট নাম পেয়ে যায়। ষোল বছরের কম বয়সের যে-সমস্ত শূদ্র ছেলেদের উনি যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী করতেন, তাদের অনেককে কায়স্থ বর্ণে উন্নীত করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। ওলন্দাজ পর্যটক ভান-দ্রেন ব্রুক ১৫৬০ সালে হালিশহরের প্রতিপত্তিতে বেশ অবাক হয়েছিলেন। হালিশহরের কালিকাতলা ঘাট থেকে ছিল পূর্ববঙ্গে ভূষণা যাবার জলপথ।

পাঁচু শক্তি খানের পর তাঁর ছেলে শম্ভুপতি, এবং নাতি জিয়া বা কামদেব ব্রহ্মচারী, হালিশহরকে শিক্ষা এবং বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। অষ্টাদশ শতকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে নবদ্বীপের প্রতিপত্তির আগে, পাঁচু শক্তি খান প্রতিষ্ঠিত হালিশহর শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নিম্নবঙ্গে সর্বাধিক খ্যাতিপ্রাপ্ত ছিল। বহু টোল এবং পণ্ডিতমশায় ছিলেন সেখানে। এমনকি চৈতন্যদেব যে হালিশহরের জনৈক পণ্ডিতমশায়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন, সে প্রসঙ্গ আছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। সম্ভবত কামদেবের সন্ন্যাস, আর তাঁর মোগল-খেতাব প্রাপ্তির পর, লক্ষ্মীকান্ত হালিশহরে বসবাস না-করায়, বসতটি ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়ে ফ্যালে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত জিয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৫৩৫- ১৬২০) কোনও ছেলেপুলে হয়নি। তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীর বয়স, লক্ষ্মীকান্ত'র জন্মের সময়ে ছিল কুড়ি। রজঃস্বলা হবার সাত বছর পরও পদ্মাবতীর সন্তান না হওয়ায়, আত্মীয়-স্বজনরা বিরক্ত, ক্রুদ্ধ আর হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তা সত্ত্বেও জিয়া আবার বিয়ে করেননি, কেননা পদ্মাবতী সত্যিই সুন্দরী ছিলেন। অতীব সুন্দরী ছিলেন বলেই, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকন্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ছেলের বউ করে এনেছিলেন শম্ভুপতি। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরা কুলিনের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু কুলীনকন্যাকে বিয়ে করতে পারতেন না।কুলগুরুর পরামর্শে জিয়া ও পদ্মাবতী দুজনে তাঁদের পারিবারিক ঈশ্বরী কালীক্ষেত্রের কালীমূর্তির কাছে তিন দিন তিন রাত্রি সাষ্টাঙ্গ প্রার্থনা জানাবার পর, তৃতীয় রাতে, পদ্মাবতী, মন্দির-সংলগ্ন জলাশয়ের উপরিতলে, মন্দিরের পূর্বদিকে, ভাসমান জ্যোতির্মন্ডলীর দিকে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পদ্মাবতী জিয়াকে জানান, তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন যে, জলাশয়টিতে আলোর বৃত্ত দেখা দেবার পর তাতে স্নান করলে, তাঁর একটি ছেলে হবে। পরের দিন, জলাশয়টিতে স্নান করতে গিয়ে, পদ্মাবতী দেখতে পেলেন যে, জলের ভেতর থেকে এজকন মহিলার ডান বাহু তাঁকে ইশারা করছে।তিনি ওই নারীর নির্দেশ শুনতে পেলেন যে, ওই জলাশয়ের তলদেশে সতীর ডান পায়ের অংশটি আজও পড়ে আছে, আর সে-কথা যেন তাড়াতাড়ি সেবায়েতদের জানানো হয়। পদ্মাবতী ছোটোবেলায় শুনেছিলেন যে দক্ষযজ্ঞের সময়ে বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা সতীদেহের একান্নটি টুকরো কনখল থেকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যার একটি, ডান পায়ের কড়ে আঙুল, এসে পড়েছিল, কালীক্ষেত্রের কালীমন্দির যে জায়গাটিতে, ঠিক সেখানে। পদ্মাবতীর নির্দেশে সেবায়েতরা পুকুরে নেমে একজন মহিলার অশ্মীভূত ডান পা আবিষ্কার করেছিলেন। সেটি কালী মন্দিরের লোহার সিন্দুকে চিরকালের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল বলে কিংবদন্তি।

ঘটনাটির এক বছর পর ৯৭৭ বঙ্গাব্দে, আশ্বিন মাসের লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন বিকাল চারটে পনেরোয় লক্ষ্মীকান্ত'র জন্ম হয়, আর সে-কারণেই তাঁর অমন নামকরণ। তারপর থেকে জলাধারটিতে স্নান করলে ছেলেপুলে হয়, এমন গল্প ছড়িয়ে পড়ে সুবে বাংলায়। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সার্বভৌমের লেখা কালীঘাট ইতিবৃত্তগ্রন্থে ক্রমবর্ধমান স্নানার্থিনীদের ভিড়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছিল। উনি গ্রন্থটিতে তাঁর নিজের বিশ্বাস এবং স্নানার্থিনীদের সন্তানপ্রাপ্তির সাফল্যের কাহিনি লিখে গেছেন। লক্ষ্মীকান্ত'র সময়ে অবশ্য কালীঘাট শব্দটির উদ্ভব হয়নি। বলা হতো-কালীক্ষেত্র কালীপীঠ। দক্ষিণে বেহালা থেকে উত্তরে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কালীক্ষেত্র এলাকাটি। ইংরাজদের আঁকা মানচিত্র থেকে অনুমান করা যায় যে লক্ষ্মীকান্ত'র ছেলেদের নাতিনাতনিদের সময়েও আদিগঙ্গা, যা এখন অত্যন্ত নোংরা টালির নালায় রূপান্তরিত হয়েছে, তা হুগলি নদীর চেয়ে চওড়া ছিল। অর্থাৎ, কিংবদন্তিটির পবিত্রতা বহাল ছিল বহুকাল পর্যন্ত। পাঁচু শক্তিখান, শ্যামরায় এবং কালী, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাবকল্পের পুজার প্রচলন করেন পারিবারিক স্তরে। চৈতন্যদেবের প্রভাবের কারণে শ্যাম রায় আর যোদ্ধা ছিলেন বলে কালী। কালীঘাটের বর্তমান বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জিয়া গঙ্গোপাধ্যায়, লক্ষ্মীকান্ত'র জন্মের কারণে। সংলগ্ন ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন লক্ষ্মীকান্ত'র মেজ ছেলে গৌরীর (১৬০০-১৬৬৯) নাতি কেশবরাম (১৬৫০-১৭২৬) এবং সেই সূত্রে কালীঘাট আখ্যাটির উদ্ভব। মন্দিরটি তৈরি করানো আরম্ভ করেন কেশবরামের ছেলে শিবদেব (১৭১০-১৭৯৯), আর তা ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ করেন তাঁর উত্তরাধিকারী রাজীবলোচন । খরচ হয়েছিল তিরিশ হাজার টাকা।তাঁর বংশধর, বড়িশা-নিবাসী কালীকান্ত, উনিশ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত মন্দিরটির পুজো এবং অন্যান্য কাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন। বিড়লাদের হিন্দুস্তান চ্যারিটি ট্রাস্ট মন্দিরকে সারিয়ে তোলে দেশভাগের পর। পুজো দিতে উনিশ শতক থেকেই বহু লোক আসতেন বটে, কিন্তু পরিবেশ এখনকার মতন বীভৎস ছিল না, যা টের পাওয়া যায় সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত কালীক্ষেত্র দীপিকা

গ্রন্থটি থেকে। লক্ষ্মীকান্ত'র প্রতি শ্রদ্ধায় কালীঘাটে দক্ষিণা কালিকা কার্তিকী অমাবস্যার রাতে লক্ষ্মীরূপে পূজিত হন। পরবর্তীকালে অব্রাহ্মণরা মহালয়ার পরবর্তী কার্তিকী অমাবস্যার রাতে কালীপূজার প্রচলন করেন। লক্ষ্মীকান্ত'র জন্মের তিন দিন পর মারা গেলেন পদ্মাবতী। সতীর মরদেহের পাশে বসে জিয়া তাঁর সদ্য-ভূমিষ্ঠ ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছিলেন যখন, তখন হঠাৎ ছাদের কড়িকাঠের ফোকর থেকে একটি টিকটিকির ডিম তাঁর সামনে পড়ে ফেটে যায়। ফাটা ডিমটি থেকে বেশ কসরৎ করে বেরিয়ে আসে টিকটিকির খুদে বাচ্চা। কিন্তু বেরোবার পর সামান্য এগিয়ে টিকটিকির ছানাটি মৃতপ্রায় পড়ে থাকে চুপচাপ। একটা ছোট্ট পিঁপড়ে এগিয়ে যায় টিকটিকিটির কাছে। সদ্য ডিম ফুটে বেরোনো টিকটিকি পাশ ফিরে গপ করে গিলে ফ্যালে পিঁপড়েটাকে। ঘটনাটিতে দৈববার্তা খুঁজে পান জিয়া, যে, ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। তালপাতার একটা শুকনো পাতায় নীচের এই কটা কথা লিখে, স্ত্রীর দাহ-সংস্কারের পর, তা শিশুটির বুকের ওপর রেখে, বেরিয়ে পড়েন বাড়ি ছেড়ে:

”কাকঃ কৃষ্ণঃ কৃতো যেন হংসশ্চ ধবলীকৃতঃ।
ময়ূরশ্চিত্রিতো যেন তেন রক্ষং ভবিষ্যতি।।”
অর্থ:-যিনি, কাককে কালো করেছেন, হাঁসকে সাদা করেছেন, ময়ূরকে চিত্রবিচিত্র করেছেন, তিনিই একে রক্ষা করবেন।
জিয়া নিজেই নিজের সন্ন্যাস নাম নেন কামদেব, নিজেকে কাম থেকে মুক্ত রাখার অভিপ্রায়ে।যেহেতু আত্মারাম ব্রহ্মচারী ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু, তাই সন্ন্যাসজীবনে পরিচিত হন কামদেব ব্রহ্মচারী হিসাবে। ডেরা নেন কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে। রেলগাড়িহীন তখনকার দিনে পায়েহেঁটে বা নৌকায় কাশী পৌঁছাতে কতদিন লেগেছিল, সেসব কথা শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী তাঁর বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাসগ্রন্থে বা অতুলকৃষ্ণ রায় তাঁর এ শর্ট হিসট্রি অব ক্যালক্যাটা গ্রন্থে লিখে যাননি। জিয়ার সন্ন্যাস নেবার পর, লক্ষ্মীকান্তর দায়দায়িত্ব নিলেন কালী মন্দিরের সেবায়েত আত্মারাম ব্রহ্মচারী আর তাঁর সহায়ক আনন্দ গিরি।লক্ষ্মীকান্ত নামটি আত্মারাম-এর দেয়া, যদিও আনন্দ গিরি তাঁকে লক্ষ্মীনারায়ণ বলে ডাকতেন, আর কৈশোর পর্যন্ত তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ নামেই পরিচিত ছিলেন। আত্মারাম ব্রহ্মচারী তাঁর জন্য সংস্কৃত সাহিত্য, ন্যায় শাস্ত্র, ফারসি, আরবি ও গণিত শিক্ষার ব্যবস্হা করেন। সেই সঙ্গে শরীর গঠন, ব্যায়াম আর কুস্তি শেখাবার লোক রাখেন।

সরকার সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম রাজস্ব বিভাগে অনায়াসে চাকরি পেয়ে যান লক্ষ্মীকান্ত, মূলত গণিতে সড়গড় আর বিভিন্ন ভাষা বলতে-লিখতে জানার জন্য।এখন হুগলি জেলার ত্রিশবিঘা রেলস্টেশন যেখানে, তার কাছাকাছি ছিল সপ্তগ্রাম বাণিজ্য বন্দর বা সাতগাঁ, যা ক্রমে গুরুত্বহীন হবে যায় ১৬৩২ সালে সরস্বতী নদীর স্রোত শুকিয়ে যাবার দরুন। সাতগাঁ ছিল শ্রীহরি গুহ, ওরফে রাজা বিক্রমাদিত্যের জাগিরের অধীন। এই জাগির অবশ্য কর্নওয়ালিসের জমিদারি প্রথার জমিদারি নয়। শ্রীহরি গুহ এবং তাঁর দাদা জানকীবল্লভ ছিলেন গৌড় অধিপতি দাউদ খাঁ'র বিশ্বস্ত মন্ত্রী। দায়ুদ খাঁ'র কাছ থেকে তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি এবং পরে টোডরমলের কাছে যশোহরের জমিদারি পান। খুলনা তখন যশোহরের অন্তর্গত ছিল। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে আফগান সুলতান দাউদ খাঁ হেরে গেলে বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু স্থানীয় সামন্তরা আকবরের হুকুম মানতেন না, বিশেষ করে আফগান সামন্তরা। শ্রীহরি গুহ নিজের জমিদারির সত্তর শতাংশ ছেলে প্রতাপাদিত্যকে আর তিরিশ শতাংশ ভাই বসন্ত রায়কে ভাগ করে দিয়েছিলেন। প্রতাপাদিত্য চেয়েছিলেন পুরো জমিদারি তাঁকেই দেয়া হোক। কিন্তু শ্রীহরি গুহ বসন্ত রায়ের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন কেননা বসন্ত রায় বাংলার সুবেদার রাজা টোডরমলকে রাজস্ব নির্ধারণে সাহায্য করেছিলেন। এখানে, একটা কথা বলা দরকার! এই টোডরমলের সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। রাজা বসন্ত রায়ের সহায়তায় টোডরমল ভারতে রাজস্ব আদায় কি ভাবে আদায় করা উচিত, তার ওপরে একটি রূপরেখা তৈরী করেছিলেন। তার ভিত্তিতে এখনও ভারতে এবং সারা পৃথিবীতে মোটামুটি সেই ভাবেই রাজস্ব আদায় করা হয়! আমাদের পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল- মরহুম সৈয়দ নুরুল হাসান, এর সম্বন্ধে একটি বই লিখে গেছেন। দি রেভিনিউ সিষ্টেম অফ টোডরমল ।

আবার ফিরে আসি, মূল কথায়।ভাষা এবং গণিতে সড়গড়, কর্মক্ষম, আর প্রত্যুৎপন্নতার জোরে সহজেই বিক্রমাদিত্যের নজরে পড়েন লক্ষ্মীকান্ত। বিক্রমাদিত্যের ছেলে প্রতাপাদিত্য তখন বাবার আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষক আধিকারিক ছিলেন। বিক্রমাদিত্য লক্ষ্মীকান্তকে নিয়ে এলেন তাঁর ছেলের বিভাগে যাতে দুজনার বন্ধুত্ব থেকে প্রতাপাদিত্য আর রাজস্বের লাভ হয়। ভুঁইঞা থেকে জাগিরদার হয়ে বিক্রমাদেত্যের ঝঞ্ঝাট বেড়ে গিয়েছিল। বয়সে প্রতাপাদিত্য দশ বছরের বড় হলেও, লক্ষ্মীকান্তের সঙ্গে তাঁর নিকট বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বিক্রমাদিত্যের ছেলে প্রতাপাদিত্য তখন বাবার আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষক আধিকারিক ছিলেন। বিক্রমাদিত্য লক্ষ্মীকান্তকে নিয়ে এলেন তাঁর ছেলের বিভাগে যাতে দুজনার বন্ধুত্ব থেকে পপতাপাদিত্য আর রাজস্বের লাভ হয়। ভুঁইঞা থেকে জাগিরদার হয়ে বিক্রমাদেত্যের ঝঞ্ঝাট বেড়ে গিয়েছিল। বয়সে প্রতাপাদিত্য দশ বছরের বড় হলেও, লক্ষ্মীকান্তের সঙ্গে তাঁর নিকট বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

তার মাত্র কয়েক বছর আগেই সম্রাট আকবর সুবে বাংলার দখল নিয়েছিলেন। এবং যদিও সম্পূর্ণ বঙ্গদেশকে বাগে এনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে উঠতে পারেননি, বিভিন্ন ভূখন্ডের সামন্ত, যাঁরা ভুঁইঞা (ভৌমিক) নামে খ্যাত ছিলেন, মোগল দখলদারির আগে প্রায় স্বাধীন ছিলেন, এবং কেবল নাম-কা-ওয়াস্তে মোগল নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়েছিলেন।বিক্রমাদিত ্যের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছিল এই সামন্তরাজদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়, আর সেই সঙ্গে তাঁদের এলাকা থেকে মোগল সৈন্যবাহিনীর জন্য বাঙালি সৈন্য এবং খরচাখরচ যোগাড় করা।সমতট এলাকাটি প্রায় সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। ভুঁইঞাদের দেখাদেখি ছোটখাট সামন্তরাও সরকারি পাওনা মেটাতে অস্বীকার করতে লাগলেন। পরে, বিক্রমাদিত্যের নিজেরই ছেলে যশোহরের প্রতাপাদিত্যসহ বারোজন সামন্ত খ্যাত হন বারো ভুঁইঞা নামে। বাকি এগারোজন হলেন বিক্রমপুরের কেদার রায়, ভাওয়ালের ফজল বাহাদুর গাজি, খিদিরপুরের ইশা খাঁ, সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ, চাঁদপ্রতাপের চাঁদ গাজি, ভূষণার মুকুন্দ রায়, চন্দ্রদ্বীপের বা বরিশালের কন্দর্পনারায়ণ রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, পুঁটিয়ার রাজা, তাহিরপুরের রাজা এবং দিনাজপুরের রাজা। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সমরনায়ক ছিলেন ইশা খাঁ; যাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল ঢাকা জেলার অর্ধাংশ, ময়মনসিংহ, পাবনা, রংপুর জেলার কিছু অংশ থেকে ত্রিপুরার সারাইল পর্যন্ত।

লক্ষ্মীকান্ত'র দৌত্য ও পরিকল্পনায় প্রতাপাদিত্য ভুঁইঞাদের নিয়ন্ত্রণে আনলেন, যশোহরের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করলেন, এবং প্রজাহিতকর কাজে হাত দিলেন। লক্ষ্মীকান্তের দৌত্যে বাখরগঞ্জের রাজা রামচন্দ্রের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দিয়ে প্রতিপত্তি বাড়ালেন প্রতাপাদিত্য। মোগল সুবেদার ইসলাম খাঁর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সন্ধি করালেন লক্ষ্মীকান্ত। ক্রমে পাশ্ববর্তী রাজাদের হারিয়ে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনলেন খুলনা আর চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রতাপাদিত্য এবং লক্ষ্মীকান্ত নিজেরা দিল্লি গিয়ে আকবরের সঙ্গে দেখা করে পুরো বকেয়া মিটিয়ে দিয়ে এলেন। তার প্রতিদানে আকবর প্রতাপাদিত্যকে দিলেন মহারাজার সনদ এবং লক্ষ্মীকান্তকে মজুমদার উপাধি। মৌজার ভূস্বামীরা 'মজমুয়াদার' অভিহিত হতেন। ফারসি মজমুয়াদার বাংলায় হয়ে গেছে মজুমদার। মহারাজার খেতাব, পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে। মোগল সুবেদারের সঙ্গে সন্ধিভঙ্গ করলেন। লক্ষ্মীকান্ত'র পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে লাগলেন তিনি।

সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্গদেশের তখতে শের খাঁ আসার পর, তখতের আধিকারিকদের মধ্যে জোচ্চুরি, খেয়োখেয়ি আর দৌরাত্ম্য এমন বেড়ে গেল যে সৈন্যদের আর সম্রাটের কর্মচারীদের মাইনে দেয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। ভেঙে পড়ল শাসন-ব্যবস্থা। প্রজাদের মধ্যে দেখা দিল তীব্র অসন্তোষ। সুযোগ বুঝে শের খাঁকে অগ্রাহ্য করতে লাগলেন প্রতাপাদিত্য। শের খাঁ আক্রমণ করতে পারেন আঁচ করে, পর্তুগিজ রণকুশলী জলদস্যু রোদ্দা'র সহায়তায় এক শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তুললেন প্রতাপাদিত্য। শের খাঁ তার আধখ্যাঁচড়া আধাপেটা সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলেন প্রতাপাদিত্যের সেনাদের, যার নেতৃত্বে ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত, এবং হেরে নাস্তানাবুদ হয়ে ফিরে গেলেন। লক্ষ্মীকান্ত, প্রতাপাদিত্যের মহারাজা খেতাব পাবার সময়ে, মোগল সম্রাটের কাছ থেকে মজুমদার খেতাব পান বলে, এসময়ে লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার হিসাবে খ্যাত হন। বারবার সম্রাটের সেনার আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হবে না আঁচ করে প্রতাপাদিত্য তাঁর কাকা জানকীবল্লভ গুহ, যিনি রাজা বসন্ত রায় নামে খ্যাত ছিলেন, এবং সুন্দরবনের বেশ কিছুটা অঞ্চল পরিষ্কার করে বসত গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে থাকা নিরাপদ মনে করলেন।কারণ একটাই।সুন্দরবনের নদী, খাঁড়ি, নালার অলিগলিতে পর্তুগিজ নাবিক রোদ্দা'র ডিঙিনৌকা আর পালতোলা জাহাজের চোরাগোপ্তা আক্রমণ সামলে প্রতাপাদিত্যের কাছে পৌঁছানো সম্রাটের বাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রাজা বসন্ত রায় ছিলেন ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব, প্রজাবৎসল, এবং তাঁর সাহায্যেই যশোহর রাজত্বের গোড়াপত্তন হয়েছিল। তাঁর সামান্য সম্পত্তির অধিকারের লোভে প্রতাপাদিত্য এবার বসন্ত রায়কে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন। রাজ্য শাসনের বহু ব্যাপারে বসন্ত রায়ের পরামর্শ নিতেন লক্ষ্মীকান্ত, এবং অগাধ শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারা মাত্র চাকরিতে ইস্তফা দিলেন আতঙ্কিত লক্ষ্মীকান্ত, এবং ফিরে গেলেন হালিশহরে, স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। বসন্ত রায়কে হত্যা করার পর প্রতাপাদিত্য তাঁর ছেলেকেও খুন করতে ছেয়েছিলেন, যিনি মানকচুর বনে কয়েকদিন লুকিয়ে থেকে বেঁচে যান। লোকমুখে তাঁর নামকরণ হয় কচু রায় ।

লক্ষ্মীকান্ত কোন সালে কোন পরিবারে বিয়ে করেছিলেন, এবং তাঁর স্ত্রী বা স্ত্রীদের নাম-ধাম-পিতামাতা সম্পর্কে বিশেষ তথ্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার রচিত বংশ পরিচয়,সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিত যশোহর খুলনার ইতিহাস বা গোরাচাঁদ রায়চৌধুরী সম্পাদিত লক্ষ্মীকান্ত-- এ চ্যাপটার ইন দি সোশাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এটুকু জানা যায় যে তাঁর একাধিক স্ত্রী ছিল, এবং প্রথমা স্ত্রীর নাম ভগবতীরানী। তবে তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য যে বিশেষ ছিল না, তা অনুমান করা যায়, কেননা তাঁর সাত ছেলে আর চার মেয়ের মধ্যে প্রথম সন্তান রাম-এর জন্ম যে সময়ে হয়, যখন লক্ষ্মীকান্তর বয়স মাত্র কুড়ি। সবচেয়ে ছোট ছেলের জন্ম যখন হয় তখন তিনি ষাট পেরিয়ে গেছেন, এবং সুবে বাংলার একজন বিখ্যাত জাগিরদার। তাঁর ছেলেরা হলেন রাম, গৌরী,

গোপাল, বীরেশ্বর, কৃষ্ণ, গোপী ও মহাদেব। সমস্ত নামই পারিবারিক দেবী-দেবতা শ্যামরায় ও কালীকেন্দ্রিক। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নামকরণের অমন পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় ছিল।

প্রতাপাদিত্যের সংস্পর্শে থাকলে তাঁর যে ক্ষতি হতো তা হালিশহরে বসে কিছুকালের মধ্যেই টের পেলেন লক্ষ্মীকান্ত। প্রথমে আজিম খাঁ, এবং তার কিছুকাল পরে ইব্রাহিম খাঁ'র নেতৃত্বে আকবর যে সৈন্যবাহিনী প্রতাপাদিত্যকে কাবু করার জন্য পাঠালেন, তারা সুন্দরবনের খাঁড়ি, জঙ্গল আর ম্যালেরিয়ায় বিধ্বস্ত হয়ে গেল। অমন আধমরা সেনাদের মেরে তাড়াতে বিশেষ বেগ পেতে হল না রোদ্দা'র সৈন্যদের। প্রতিদানে, রোদ্দা'র অনুরোধে, পর্তুগিজ মিশনারি যাজক ফাদার ফনসেকাকে প্রতাপাদিত্য তাঁর রাজধানি যশোহরে যে খ্রিস্টান গির্জা তৈরির অনুমতি দেন, সেইটিই বাংলার প্রথম গির্জা। এর পর বেশ কিছুকাল বাংলার ওপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ প্রায় ছিল না। ইশা খাঁ ও তার ছেলে মুসা খাঁ প্রথমে মোগল সেনাপতি শাহ বরদি কে, ও পরে হুসেন কুলি খাঁ'র সেনাদের নিজের এলকা থাকে মেরে তাড়ান।

শাহজাদা সেলিম, ১৬০৫ সালে নুরুদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গির নামে সম্রাটের তখতে বসার পর, বঙ্গদেশ থেকে রাজস্ব, সৈন্যখরচ, ও সেনা সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে দেখে সেনাধিপতি মান সিংহকে বিপুল বাহিনীসহ নির্দেশ দিলেন, যাতে প্রতাপাদিত্য এবং অন্যান্য ভূস্বামী যাঁরা মোগল সাম্রাজ্যকে অবজ্ঞা করে চলেছেন, তাঁদের বিদ্রোহ দমন করা যায়। মান সিংহ বঙ্গদেশের উদ্দেশ্যে পথে ও নৌকায় বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা দিলেন। পথে মৃত সৈন্যদের দাহ ও ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে তিনি কয়েকদিন কাশীতে অবস্থান করেন।কাশিতে বাঙালি সাধু-সন্ন্যাসীদের আধিক্যে মান সিংহ সুবিধা পান। তিনি বাংলার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন; সেখানকার আয়ুর্বেদিক গাছপালা যা আহতদের জন্য প্রয়োজন হবে তার তথ্য সংগ্রহ করেন। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথাবার্তার সূত্রে তিনি জনৈক জ্ঞানী সন্ন্যাসীর বিপুল জ্ঞানভান্ডার দ্বারা অভিভূত হন। তিনি অবাক হন দেখে যে সংস্কৃত, ফারসি, আরবি ও স্থানীয় অওধিভাষা জানা মানুষটি পাঁচু শক্তি খানের বংশধর। সন্ন্যাসীটি ছিলেন কামদেব ব্রহ্মচারী। যেহেতু শক্তিপূজকদের আক্রমণ করতে যাচ্ছেন, তাই তিনি কামদেব ব্রহ্মচারীর নিকট কালীমন্ত্রে দীক্ষা নেন ।

মোগল সেনাপতি মান সিংহের সঙ্গে সালকা ও মগরাঘাটে প্রতাপাদিত্যের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ হয়। ইতিমধ্যে ভাওয়ালের ভুইঞা বাহাদুর গাজি মোগল পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন ও মান সিংহকে নিজের বাঙালি সেনা সরবরাহ করেছিলেন। এবার প্রতাপাদিত্য হেরে যান। তার প্রধান কারণ ভবানন্দ মজুমদার নামে একজন তালুকদারের বিশ্বাসঘাতকতায়। ভবানন্দ বর্ধমানে গিয়ে মান সিংহের সঙ্গে দেখা করেন ও কী ভাবে প্রতাপাদিত্যকে ঘিরে ফেলা যায় তার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। ভবানন্দের বংশধররা পরবর্তীকালে খ্যাত হন নদীয়ার রাজা নামে। পরাজিত প্রতাপাদিত্য আত্মসমর্পন করেন। তাঁকে বন্দি করা হয়। নবদীক্ষিত মান সিংহ প্রতাপাদিত্যের আরাধ্যা যশোরেশ্বরীকে এবং তাঁর বাঙালি পুরোহিতদের নিজের সঙ্গে নিয়ে যান, এবং বিশেষ মন্দির গড়ে প্রতিষ্ঠা করেন রাজস্থানের অম্বরে। আরো বহু বন্দীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যকে দিল্লি নিয়ে যাবার দায়িত্ব মান সিংহ দিয়েছিলেন ইসলাম খাঁকে । কিন্তু ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে জানোয়ারের মতন লোহার খাঁচায় বন্দি করে নিয়ে যান। বন্দী অবস্থায় দীর্ঘ যাত্রা সহ্য হয়নি প্রতাপাদিত্যের। পথে, ১৬১০ সালে, তিনি মারা যান এবং তাঁর দেহসংস্কার হয় কাশীতে। মান সিংহ দিল্লি পৌঁছে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর সংবাদ পান। আকবরের সামনে বন্দি প্রতাপাদিত্যকে হাজির করা হয়ে ওঠেনি তাঁর, এবং সেকারণে ইসলাম খাঁর কাছে ক্রোধ ও সম্রাটের কাছে ক্ষমা চান।

যুদ্ধে সাফল্যের পর মান সিংহ মণিকর্ণিকা ঘাটে শ্রদ্ধা জানান কামদেব ব্রহ্মচারীকে। মান সিংহ কামদেবের কাছে জানতে চান যে সম্রাট তাঁর জন্য কী করতে পারেন !!!!কামদেব তাঁকে জানান যে লক্ষ্মীকান্তকে যদি মৌজাস্তরের ভূস্বামী থেকে উন্নীত করা হয় তাহলে তার ও তার সন্তান-সন্ততিদের সুবিধা হয়। নদীয়ারাজের পূর্বজ ভবানন্দ কানুনগোকে, যিনি বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ প্রতাপাদিত্যের এলাকার মালিকানা পেলেন, মান সিংহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, লক্ষ্মীকান্তকে যেন যথেষ্ট ধনসম্পত্তি দেয়া হয়। মান সিংহ মোগল সম্রাটের কাছেও কামদেব ব্রহ্মচারীর বার্তা পৌঁছে দিলেন। মোগল সম্রাট একটি ফরমান জারি করে বাঁশবেড়িয়ার শূদ্রমণি রাজার সাহায্যে লক্ষ্মীকান্তকে হালিশহর থেকে সম্রাটের কাছে নিয়ে গেলে মোগল সম্রাট লক্ষ্মীকান্তকে "রায় মজুমদার চৌধুরী" উপাধি ও সেই সঙ্গে জাগিরদারের পতাকা, নাকাড়া এবং ঝালরদার পালকি উপহার দিলেন। 'রায়' উপাধিটি অস্থাবর সম্পত্তির জন্য এবং 'চৌধুরী' উপাধি স্থাবর সম্পত্তির জন্য। আসলে ফারসি বয়ানের 'চৌধারি' বাঙলায় করে নেয়া হয়েছিল 'চৌধুরী'। লক্ষ্মীকান্ত তাঁর নামের আগে রায় এবং নামের পর মজুমদার চৌধুরী ব্যবহার করতেন। মোগল দরবারে লক্ষ্মীকান্তকে বলা হতো 'রায় লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার চৌধুরী'। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়ানি দেবার পর লক্ষ্মীকান্ত'র বংশধররা নিজেদের নাম থেকে মজুমদার শব্দটি ত্যাগ করেন। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় তাঁদের উপাধিটি হয়ে দাঁড়ায়- পদবী।

মান সিংহ কামদেব ব্রহ্মচারীকে গুরু-মহাত্মা সম্বোধন করতেন বলে, উত্তরভারতে তিনি মহাত্মা কামদেব ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন। সেসময়ের বিভিন্ন ধর্মপুস্তকে তাঁর উল্লেখ আছে।

নূতন ব্যবস্থায় লক্ষ্মীকান্ত'র বাৎসরিক আয় দাঁড়াল বারো লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা। মোগল সম্রাট লক্ষ্মীকান্তকে রাজা উপাধি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু দেবীবর ঘটকের কুলীন প্রথা প্রয়োগ ও অপব্যবহারের প্রেক্ষিতে, ব্রাহ্মণের নামে রাজা শব্দটি খাপ খাবে না অনুমান করে তিনি নিতে সবিনয়ে অস্বীকার করেছিলেন। তাছাড়া প্রথমে পাঁচু শক্তি খান আর পরে লকজম্মীকান্ত নিজে অসিযোদ্ধা হয়ে ক্ষত্রিয়বৃত্তি নিয়ে প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঈর্ষা ও হিংসে করার আবেগ জাগিয়ে তুলেছিলেন। যে জায়গির লক্ষ্মীকান্ত পেয়েছিলেন তা হল বেহালা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত সমগ্র কালীক্ষেত্র, পরগণা মাগুরা, খাসপুর, কলকাতা, পৈকান, আনোয়ারপুর, আমিরাবাদ, হাভেলিশহর, হাতিগড় এবং লাগোয়া সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই কলকাতা ছিল চব্বিশ পরগণার একটি পরগণা এবং কালীক্ষেত্রের ডিহিকলকাতা-সুতানুটি-গবিন্দপুর থেকে আলাদা এখনকার বৌবাজার, মির্জাপুর, সিমলা আর জানবাজার ছিল ডিহি কলকাতার অন্তর্ভুক্ত।।

গোবিন্দপুরের অন্তর্গত ছিল এখনকার হেস্টিংস, ময়দান এবং ভবানীপুর। এখনকার চিৎপুর, বাগবাজার, শোভাবাজার আর হাটখোলা ছিল সুতানুটির অন্তর্গত। ক্ষমতা বিন্যাসের প্রয়োজনে, লক্ষ্মীকান্ত হালিশহরের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় কাছারিবাড়ি তৈরি করালেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল বড়িশাগ্রাম ও ডিহিকলকাতা। ডিহিকলকাতার কাছারিবাড়ির সামনে সাবর্ণ চৌধুরীদের কুলদেবতা শ্যামরায়ের মন্দির ছিল। শ্যামরায় বেশিরভাগ সময় থাকতেন কালীঘাটে আর দোলের সময়ে যেতেন কাছারিবাড়ির মন্দিরে। দোলের সময়ে সামনের পুকুর লাল হয়ে যেত রঙ খেলার দরুণ। সেই থেকে পুকুরটির নাম লালদিঘি। সাবর্ণ চৌধুরীদের এই কাছারি বাড়িতে কেরানি ছিলেন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির দাদু, যাঁর নামে অ্যান্টনি বাগান লেন। আর কাছারিবাড়ির প্রধান হিসাবরক্ষক ছিলেন নবকৃষ্ণ দেবের বাবা রুক্মিনীকান্ত। বর্তমানে হালিশহরে শ্যামরায় পূজিত হন অরুণকিরণ রায়চৌধুরীর বাড়িতে। উত্তরপাড়ায় শ্যামরায় পূজিত হন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর বাড়িতে। অন্যান্য দোলমঞ্চ ও প্রতিমার হদিশ পাওয়া যায় না। সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর (সাবর্ণ চৌধুরীরা সিরাজের পক্ষে ছিলেন), সম্ভবত কোম্পানির সংগ্রাহকরা ব্রিটেনে নিয়ে গিয়ে থাকবেন।

মোগল সম্রাটের ফরমানে একটি বিস্তীর্ণ এলাকার জাগিরদারি লক্ষ্মীকান্ত পেলেন বটে, কিন্তু ভবানন্দ কানুনগো বেছে-বেছে ঘন জঙ্গল ও জলাভূমির অংশটি তাঁর ভাগ্যে বরাদ্দ করেছিলেন, যে অঞ্চলে উচ্চবর্ণের মানুষ বিশেষ যেতেন না। যে কয়টি গ্রাম এই অঞ্চলে ছিল, তাতে বাস করতেন সদগোপ, পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, কৈবর্ত, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ঝল্লক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয়, শৌন্ডকক্ষত্রিয় শ্রমজীবীরা। ব্রিটিশ শাসকদের প্রথম লোকগণনায় এই সমস্ত বাঙালি ক্ষত্রিয়দের শূদ্র হিসাবে বর্ণীকরণ করে দেয়া হয়েছিল। দশ বছরের মধ্যে সমতটের এই অঞ্চলে লক্ষ্মীকান্ত বন-জঙ্গল সাফ করিয়ে, জলাজমি ভরাট করিয়ে, বিভিন্ন পেশার পরিবার এনে, তাদের জমিজমা ও কাজ দিয়ে, বসবাসযোগ্য গ্রামসমূহের পত্তন করলেন। অবশ্য অ-কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবার ও বসাক, শেঠ, দত্তরা তাঁর বংশধরদের অধীন কালীক্ষেত্র অঞ্চলটিতে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করেন মারাঠা ভাস্কর পণ্ডিতের দক্ষিণবঙ্গ আক্রমণের পর।বৌবাজারে সোনার বেনেদের কয়েকটি পরিবারকে লক্ষ্মীকান্ত হালিশহর থেকে এনে ১৬১০ সালেই বসত গড়ে দিয়েছিলেন। নারদপুরাণ-এর গ্রন্হকার কবি কৃষ্ণদাস নিজের আত্মপরিচয় এইভাবে লিখে গেছেন: "সুবর্ণ বণিক কূলে উৎপত্তি আমার। সাকিন কলিকাতা বহুবাজারেতে গ্রাম। দশ দশ শত নিরানব্বই সালে। মাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে।"

সাবর্ণ চৌধুরী অভিধাটির পাশাপাশি, ভঙ্গকুলীন হবার প্রেক্ষিতে, আরেকটি কাজ করেছিলেন লক্ষ্মীকান্ত। ১৬১০ সালে বড়িশার কাছারিবাড়ির পাশে একটি আটচালা তৈরি করে প্রতিবছর শরৎকালীন দুর্গোৎসবের সূত্রপাত করেন তিনি। সপরিবারে দুর্গা, অর্থাৎ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশসহ, এইটিই সম্ভবত সুবে বাংলার প্রথম শরৎকালীন পুজো।এই পারিবারিক পুজোটিতেই প্রথম কার্তিক আবির্ভূত হলেন বাঙালি জমিদাররূপে। তার আগে কার্তিক পূজিত হতেন বর্ম-পরা যুদ্ধের দেবতারূপে, সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আদলে। তিনপুরুষ পর্যন্ত যেহেতু তাঁর সম্পত্তির বিভাজন হয়নি, তাই প্রজাদের অর্ঘ্যদানের জন্য শারদোৎসবটির জাঁকজমক ছিল বহুকাল পর্যন্ত। আওরঙজেবের পৌত্র আজিম-উস-শানের হুকুমে ১০ নভেম্বর ১৬৯৮ সালে যখন সাবর্ণ চৌধুরীদের বাধ্য করা হলো কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটির প্রজাস্বত্ত্ব ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানিকে হস্তান্তর করতে, তখন থেকে লক্ষ্মিকান্ত'র বংশধররা আর্থিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হলেন।তারপরে তাঁরা বাধ্য হলেন, ভিন্ন জীবিকার সন্ধানে, বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়তে। হস্তান্তরের সময়েও, অতবড় বিপদের মুখে, তাঁরা কিন্তু ফারসি দলিলটিতে বঙ্গদেশকে জন্নত অর্থাৎ স্বর্গ বলতে ভোলেননি।

লক্ষ্মীকান্ত'র বংশধরদের গৌরব অবসানের আরেকটি কারণ হল যে জগৎশেঠ, রাজা মহেন্দ্র, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, দুর্লভরাম, গঙ্গারাম ঠাকুর, নকুড়চন্দ্র সরকার, গোবিন্দরাম, রঘুমিত্র, শোভারাম বসাক, শুকদেব মল্লিক, দয়ারাম বসু,

হরিকৃষ্ণ ঠাকুর, দুর্গারাম দত্ত, চৈতন্য দাস, দুর্লভচরণ বসাক, চূড়ামণি বিশ্বাস, রাজারাম পালিত, নীলমণি চৌধুরী প্রমুখ হিন্দু ভূস্বামী আর বণিকরা যখন সিরাজদৌলার বিরুদ্ধে দল বেঁধে ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানিকে সাহায্য করা আরম্ভ করেছিলেন, তখনও সাবর্ণ চৌধুরীরা নবাবের পক্ষ ত্যাগ করতে পারেন নি। দেশপ্রেম তাঁদের ছিল বংশগত। নাটোরের রাণী ভবাণী কিন্তু সিরাজদৌলার বিরুদ্ধে যেতে চান নি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের কাছ থেকে প্রায়ই টাকা ধার করতেন। তাই সিরাজের বিরুদ্ধে যাওয়ার মূল প্ররোচনা ছিল তাঁরই। ফলে ইংরাজরা সাবর্ণ চৌধুরীদের আর দাঁড়াতে দেয়নি। ইংরাজদের নতুন ক্ষমতানকশায় তাঁরা একেবারে অপাংক্তেয় হয়ে যান।ধীরে ধীরে, ইংরেজদের মানদণ্ড পরিণত হয় রাজদণ্ডে।

নগর কোলকাতার সাথে সাবর্ণ পরিবারের অবিচ্ছেদ্দ সম্পর্ক ছিল। তাই এত কথা লিখলাম।